জীবনের জয়গানে সড়ক হোক মুখরিত

রেজাউল করিম সিদ্দিকী

নীরব মহামারির কেন্দ্রবিন্দুতে এক প্রতিজ্ঞা: প্রতিবছর একটি নির্দিষ্ট দিনে, গোটা জাতি এক গভীর প্রতিজ্ঞার কাছে এসে দাঁড়ায়—আর তা হলো সড়ককে নিরাপদ করার প্রতিজ্ঞা। দিনটি হলো জাতীয় নিরাপদ সড়ক দিবস। এই দিবসটি কেবল একটি ক্যালেন্ডার চিহ্নিত দিন নয়; এটি বহু ঝরে যাওয়া জীবনের প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য, অসংখ্য পরিবারের দীর্ঘশ্বাসের প্রতি সংহতি এবং ভবিষ্যতের একটি নিরাপদ পথের জন্য সম্মিলিত কণ্ঠস্বর। বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশে সড়ক দুর্ঘটনা একটি নীরব মহামারি, যা প্রতিদিন কেড়ে নিচ্ছে মূল্যবান জীবন, বিকলাঙ্গ করছে অসংখ্য মানুষকে এবং দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে বাধাগ্রস্ত করছে। এই দিবসটি তাই স্মরণ করিয়ে দেয় যে, সড়ক নিরাপত্তা কোনো ঐচ্ছিক বিষয় নয়, বরং তা আমাদের জাতীয় অস্তিত্বের জন্য একটি অপরিহার্য শর্ত। এই ফিচারটিতে জাতীয় নিরাপদ সড়ক দিবসের ঐতিহাসিক পটভূমি, বর্তমান প্রেক্ষাপট, দুর্ঘটনার কারণসমূহ, এর বহুবিধ প্রভাব এবং নিরাপদ সড়ক নিশ্চিতকরণে আমাদের সম্মিলিত করণীয় বিষয়গুলির ওপর আলোকপাত করা হবে। এটি কেবল তথ্য পরিবেশন নয়, বরং এটি সেই লক্ষ লক্ষ মানুষের বেদনা ও আশা নিয়ে লেখা, যারা একটি নিরাপদ পথের স্বপ্ন দেখে।

জাতীয় নিরাপদ সড়ক দিবসের উৎপত্তি এক মর্মন্তুদ ব্যক্তিগত ট্র্যাজেডি এবং সেখান থেকে জন্ম নেওয়া এক অদম্য আন্দোলনের ইতিহাস। এই আন্দোলনের মূল কারিগর হলেন অভিনেতা ইলিয়াস কাঞ্চন। ১৯৯৩ সালের ২২ অক্টোবর, সড়ক দুর্ঘটনায় তাঁর স্ত্রী জাহানারা কাঞ্চন অকাল মৃত্যুবরণ করেন। এই ব্যক্তিগত শোক তাঁকে শুধু ভেঙে দেয়নি, বরং তাঁকে এক বৃহত্তর সামাজিক দায়িত্ব পালনে উদ্বুদ্ধ করে। স্ত্রীর মৃত্যুর পর ইলিয়াস কাঞ্চন ব্যক্তিগত বেদনাকে জাতীয় কল্যাণে উৎসর্গ করে জন্ম দেন ‘নিরাপদ সড়ক চাই’ (নিসচা) নামের একটি সংগঠনের। দীর্ঘ দুই দশকেরও বেশি সময় ধরে নিসচা সড়ক নিরাপত্তার দাবিতে আন্দোলন করে আসছে, যার মূল স্লোগান ছিল—'পথ যেন না হয় শ্মশান'। তাঁদের নিরলস প্রচেষ্টা, সচেতনতামূলক কার্যক্রম এবং সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টির ফলস্বরূপ ২০১৭ সালের ৫ জুন, মন্ত্রিসভার বৈঠকে ২২ অক্টোবরকে ‘জাতীয় নিরাপদ সড়ক দিবস’ হিসেবে ঘোষণা করা হয়।

এই ঘোষণা কেবল একটি দিবসের সূচনা ছিল না, এটি ছিল সড়কে জীবন সুরক্ষার দাবিতে সাধারণ মানুষের দীর্ঘদিনের দাবির প্রতি রাষ্ট্র কর্তৃক এক আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি। দিবসটি এখন জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সকলের অংশগ্রহণে পালিত হয়, যা সড়ক নিরাপত্তার গুরুত্বকে সর্বস্তরে পৌঁছে দিয়েছে। দিবসটির এবারের প্রতিপাদ্য নির্ধারন করা হয়েছে, “মানসম্মত হেলমেট ও নিরাপদ গতি, কমবে জীবন ও সম্পদের ক্ষতি”। বর্তমান প্রেক্ষাপটে এ প্রতিপাদ্য যথেষ্ট যুক্তি যুক্ত ও তাৎপর্যপূর্ণ। ব্যয় সাশ্রয়ী ও দ্রুত বাহন হিসেবে মোটর সাইকেলের জনপ্রিয়তা দিন দিন বাড়ছে। সম্প্রতি রাইড শেয়ারিং এর জন্য এর চাহিদা ব্যাপক। রাজধানী ঢাকাসহ ব্যস্ত শহরগুলিতে দ্রুত গন্তব্যে পৌছাতে যাত্রীরা রাইড শেয়ারিং এর মাধ্যমে মোটরসাইকেলে যাত্রা করছে। গ্রামাঞ্চলে সঙ্কীর্ণ রাস্তায় যাত্রী পরিবহনে ব্যবহৃত হচ্ছে মোটর সাইকেল। খুব দ্রুতগতির ও খুব ঝুঁকিপূর্ণ হওয়ায় প্রায়ই এসব মোটরসাইকেল দুর্ঘটনায় পতিত হচ্ছে। তাছারা এসব যানবাহণের বেশিরভাগ চালক অদক্ষ ও অপেশাদার হওয়ায় দুর্ঘটনা ঘটছে বেশি। মোটরসাইকেলের ক্ষেত্রে যাত্রী ও চালকের জন্য হেলমেট অপরিহার্য। হেলমেট যাত্রী ও চালকের সুরক্ষা বাড়ায়। তাই বর্তমান প্রেক্ষাপটে এই প্রতিপাদ্য যথেষ্ট যুক্তিযুক্ত।

চালক সড়ক দুর্ঘটনার বর্তমান চিত্র কেবল উদ্বেগজনক নয়, রীতিমতো আতঙ্কজনক। যদিও প্রতিবছর সরকারি ও বেসরকারি সংস্থাগুলো দুর্ঘটনার পরিসংখ্যান প্রকাশ করে, কিন্তু প্রকৃত সংখ্যাটি প্রায়শই প্রকাশিত সংখ্যার চেয়ে অনেক বেশি হয় বলে ধারণা করা হয়। দুর্ঘটনার সবচেয়ে বড়ো মূল্য দিতে হয় মানুষ ও পরিবারকে। একটি দুর্ঘটনা একজন উপার্জনকারীকে কেড়ে নেয়, একটি পরিবারকে পথে বসিয়ে দেয়। দুর্ঘটনায় আহতদের দীর্ঘমেয়াদি চিকিৎসা ও পুনর্বাসনের খরচ পরিবারটিকে অর্থনৈতিকভাবে পঙ্গু করে দেয়। অন্যদিকে, তরুণ কর্মক্ষম মানুষের মৃত্যু দেশের মানবসম্পদকে দুর্বল করে দেয়। হাসপাতালে ট্রমা সেন্টারগুলোতে আহতদের ভিড় এবং নিহতের স্বজনদের কান্না যেন সড়ক দুর্ঘটনার মানবিক মূল্যকে প্রতিনিয়ত স্মরণ করিয়ে দেয়।

সড়ক দুর্ঘটনা শুধু মানবিক ক্ষতি নয়, এটি দেশের অর্থনীতির ওপরও মারাত্মক নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) এবং অন্যান্য আন্তর্জাতিক সংস্থার হিসেব মতে, সড়ক দুর্ঘটনায় দেশের মোট দেশজ উৎপাদন (GDP)-এর একটি উল্লেখযোগ্য অংশ (অনেক গবেষণায় যা ১.৫ শতাংশ থেকে ২ দশমিক ৫ শতাংশ পর্যন্ত উল্লেখ করা হয়) ক্ষতি হয়। এই ক্ষতির মধ্যে রয়েছে চিকিৎসা খরচ, সম্পত্তির ক্ষতি, উৎপাদনশীলতা হ্রাস এবং আইন প্রয়োগ ও উদ্ধারকার্যের খরচ। নিরাপদ সড়কের অনুপস্থিতি দেশের পর্যটন এবং বিদেশি বিনিয়োগকেও নিরুৎসাহিত করে। সড়ক দুর্ঘটনাকে কোনো একক কারণের ফল হিসেবে দেখা ভুল। এটি মূলত একাধিক জটিল সমস্যার আন্তঃসম্পর্কের ফল। এই কারণগুলোকে প্রধানত চারটি ভাগে ভাগ করা যায়। তা হলো অনেক চালক যথাযথ প্রশিক্ষণ ছাড়াই লাইসেন্স পান। ড্রাইভিং টেস্ট ও প্রশিক্ষণের মান আন্তর্জাতিক মানের নয়। বিশ্রামের অভাব ও ক্লান্তি: বিশেষ করে দূরপাল্লার বাস ও ট্রাক চালকরা অতিরিক্ত ট্রিপের লোভে পর্যাপ্ত বিশ্রাম নেন

না, ফলে ঘুমের ঘোরে বা ক্লান্তিতে দুর্ঘটনা ঘটে। বেপরোয়া গতি ও প্রতিযোগিতা: এক রুটে একাধিক গাড়ির মধ্যে প্রতিযোগিতা এবং সময় বাঁচানোর প্রবণতা বেপরোয়া গতিতে গাড়ি চালাতে উৎসাহিত করে। মাদকাসক্তি: কিছু চালকের মধ্যে নেশা করে গাড়ি চালানোর প্রবণতা থাকে, যা সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতাকে মারাত্মকভাবে প্রভাবিত করে। অনেক পুরনো ও ত্রুটিপূর্ণ গাড়ি, যাদের 'রোড ফিটনেস' নেই, সেগুলো জোর করে সড়কে নামানো হয়। ব্রেক ফেইলর, টায়ার বিস্ফোরণ, লাইটের সমস্যার কারণে দুর্ঘটনা ঘটে। যানবাহনের ফিটনেস যাচাইয়ের ক্ষেত্রে দুর্নীতি ও দুর্বল আইন প্রয়োগ ব্যবস্থার কারণে ত্রুটিপূর্ণ যানবাহন বহাল থাকে। পণ্যবাহী যানবাহনগুলোতে প্রায়শই অতিরিক্ত মাল বোঝাই করা হয়, যা গাড়ির নিয়ন্ত্রণকে কঠিন করে তোলে এবং দুর্ঘটনার ঝুঁকি বাড়ায়। দেশের অনেক সড়কই ভুল নকশায় তৈরি। অপরিকল্পিত বাঁক, অপ্রয়োজনীয় স্পিড ব্রেকার, ডিভাইডার না থাকা বা ত্রুটিপূর্ণ ডিভাইডার দুর্ঘটনার অন্যতম কারণ। বর্ষাকালে সড়কে জলাবদ্ধতা বা রাস্তার পিচ্ছিল ভাব দুর্ঘটনার কারণ হয়। ফুটপাত এবং সড়কের অংশ অবৈধভাবে হকার বা দোকানপাট দ্বারা দখল হয়ে গেলে পথচারী ও যানবাহন চলাচলের স্থান কমে যায়, যা দুর্ঘটনা ঘটায়। ঝুঁকিপূর্ণ মোড় বা স্থানে প্রয়োজনীয় ট্রাফিক সাইন ও সতর্কতামূলক চিহ্নের অভাব দুর্ঘটনার ঝুঁকি বাড়ায়।

রাস্তা পারাপারের সময় পথচারীদের অসতর্কতা, ফুটওভার ব্রিজ ব্যবহার না করা, মোবাইল ফোনে কথা বলতে বলতে রাস্তা পার হওয়া—এগুলোও দুর্ঘটনার কারণ। হেলমেট ব্যবহার না করা, সিটবেল্ট না বাঁধা, ভুল পথে গাড়ি চালানো—এগুলো সামাজিক অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। ট্রাফিক আইন ভঙ্গের ক্ষেত্রে কঠোরতা না দেখিয়ে আর্থিক লেনদেনের মাধ্যমে ছাড় দেওয়া বা লাইসেন্স প্রদানের ক্ষেত্রে অনিয়ম আইন প্রয়োগকে দুর্বল করে দেয়। নিরাপদ সড়ক নিশ্চিত করতে হলে সরকারি, বেসরকারি এবং জনগণ—সকলকে সম্মিলিতভাবে কাজ করতে হবে। একটি সমন্বিত এবং দীর্ঘমেয়াদি মহাপরিকল্পনা ছাড়া এই সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়। সড়ক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে বিশ্বজুড়ে স্বীকৃত '4-E' (Education, Engineering, Enforcement, Emergency Response) মডেলের পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন আবশ্যক। স্কুল পর্যায়ের পাঠ্যক্রমে সড়ক নিরাপত্তা বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা, গণমাধ্যমে নিয়মিত সচেতনতামূলক প্রচারণা চালানো, চালক প্রশিক্ষণে নৈতিকতা ও মানবিকতার বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত করা Education এর অন্তরভুক্ত। সড়ক নকশায় বৈশ্বিক মানদণ্ড (Global Standards) অনুসরণ করা বিশেষ করে দুর্ঘটনাপ্রবণ স্থান বা 'ব্ল্যাক স্পট' চিহ্নিত করে দ্রুত নকশার পরিবর্তন করা, যানবাহন ও পথচারীদের জন্য পৃথক লেন বা করিডোর তৈরি, আধুনিক ট্রাফিক সিগন্যাল ব্যবস্থা, সিসিটিভি মনিটরিং এবং ডিভাইডার স্থাপন করার মাধ্যমে Modern Engineering এর প্রয়োগ দুর্ঘটনা রোধে সহায়ক ভূমিকা রাখতে পারে।

ডিজিটাল পদ্ধতিতে ট্রাফিক আইন প্রয়োগ, চালকের লাইসেন্স প্রদানের প্রক্রিয়াকে সম্পূর্ণভাবে দুর্নীতিমুক্ত ও কঠোর করা, আইন অমান্যকারীদের ক্ষেত্রে জরিমানা ও শাস্তির পরিমাণ কঠোর ও অবিচলভাবে কার্যকর করা, ফিটনেসবিহীন যানবাহন যেন কোনোভাবেই সড়কে নামতে না পারে, তা কঠোরভাবে নিশ্চিত করতে হবে। দুর্ঘটনার পর দ্রুত আহতদের হাসপাতালে নেওয়ার জন্য 'গোল্ডেন আওয়ার' (Golden Hour)-কে গুরুত্ব দিতে হবে, জাতীয় পর্যায়ে একটি সমন্বিত ট্রমা কেয়ার ও অ্যাম্বুলেন্স নেটওয়ার্ক গড়ে তুলতে হবে। দুর্ঘটনার স্থানে দ্রুত পৌঁছানোর জন্য জরুরি হটলাইন নম্বরগুলোকে (যেমন: 999) আরও কার্যকর করতে হবে। আধুনিক প্রযুক্তি সড়ক নিরাপত্তায় এক বিশাল ভূমিকা রাখতে পারে। জিপিএস ট্র্যাকিং, ভেহিক্যাল ট্র্যাকিং সিস্টেম (VTS) এবং অটোমেটিক স্পিড ডিটেকশন ক্যামেরা ব্যবহার করে চালকদের গতিবিধি ও আইনভঙ্গের রেকর্ড রাখা সম্ভব। এসব প্রযুক্তির ব্যবহার আইন প্রয়োগকে আরও স্বচ্ছ এবং শক্তিশালী করবে। পরিবহণে মালিকদের মুনাফার চেয়ে জীবনকে বেশি গুরুত্ব দিতে হবে। চালকদের কাজের সময়সীমা নির্ধারণ করা এবং তাদের পর্যাপ্ত বিশ্রাম নিশ্চিত করা মালিকদের দায়িত্ব। শ্রমিক ইউনিয়নগুলোকেও চালকদের মধ্যে আইন মানার সংস্কৃতি তৈরি এবং মাদকমুক্ত রাখার জন্য সচেতনতা তৈরি করতে হবে। জাতীয় নিরাপদ সড়ক দিবস তাই কেবল একটি শোক বা স্মরণ দিবস নয়, এটি একটি নবজাগরণের আহ্বান। এই দিনে প্রতিটি নাগরিককে ব্যক্তিগতভাবে প্রতিজ্ঞা করতে হবে যে, তিনি নিজে আইন মানবেন, পথচারী হিসেবে সচেতন থাকবেন এবং চালক হিসেবে দায়িত্বশীল হবেন। নিরাপদ সড়ক কেবল সরকারের একার দায়িত্ব নয়। যখন একজন সচেতন নাগরিক ফুটওভার ব্রিজ ব্যবহার করে, একজন চালক গতিসীমা মেনে চলে, একজন ট্রাফিক পুলিশ পক্ষপাতহীনভাবে আইন প্রয়োগ করে—তখনই নিরাপদ সড়ক নিশ্চিত হয়। সড়ক দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যুহারকে শূন্যের কোঠায় নামিয়ে আনার বৈশ্বিক দর্শন 'ভিশন জিরো' (Vision Zero) আমাদের লক্ষ্য হওয়া উচিত। সড়ককে যদি জীবনের জয়গানের পথ হিসেবে দেখতে চাই, তবে এই প্রতিজ্ঞা ও সম্মিলিত উদ্যোগের কোনো বিকল্প নেই। জাতীয় নিরাপদ সড়ক দিবস সেই পথে হাঁটার জন্য প্রতিবছর আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয়—পথ যেন না হয় শ্মশান, জীবনের জয়গানে হোক সড়ক মুখরিত। এই অঙ্গীকারেই আমাদের ভবিষ্যতের নিরাপত্তা নিহিত।

#

লেখকঃ জনসংযোগ কর্মকর্তা
সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়।

পিআইডি ফিচার